তিরোলের বালা

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

মার্টিন কোম্পানির ছোট লাইন।

গাড়ি ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়েনি, এ নিয়ে গাড়ির লোকজনের মধ্যে নানা রকম মতামত চলছে।

—মশাই বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ি ছাড়বার নামটি নেই—কখন বাড়ি পৌঁছব ভাবুন তো?

—এদের কাণ্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইস্টিশানে দুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্!

—ওই আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়িরই সমান দশা—

—আঃ, কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ি করে! রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ি করি, কোথায় বাড়ি করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ি করতে—

—সে কোথায় মশাই?

—এই প্রসাদপুর, যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হলে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশি না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগণ্ডা হবে, পাড়াগাঁ জায়গা, শ্বশুরবাড়ির সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ি করলুম, দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে। এই স্টুপিড গাড়িগুলো—

—পঁচিশ কি স্যার, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন! আমারও পৈতৃক বাড়ি ওইপ্রসাদপুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙা। লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্তা শুনে ভয় হল। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসিমা থাকেন, মেসোমশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসিমার সনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে, তাতে কখন সেখানে পৌঁছব কে জানে?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসেছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ি, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথার চুলগুলো যেন একটু হেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ি ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁট্‌লি হাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনাসামনি বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ ভেদ করে—টু হার্টস্‌! নো ট্রাম্প! থ্রি স্পেডস্‌!

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ি খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হল। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাইবোন? কিংবা মামা-ভাগনি? মেয়েটি

বেশ সুন্দরী। ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য নয়, আজকালকার ছেলেছোকরাদের কাণ্ড তো!

যাকগে, আমার সে-সব ভাবনায় দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এল। মাসিমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন আঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। তারপর ছাড়ল। বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে ক্বচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউলতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো কালো বাদুড় উড়ে এসে বসছে, খালের পারে মশাল জ্বেলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু দুজনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে।একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে! বেশ সুন্দর চেহারা দুজনেরই। না, মামাভাগনি বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা? মার্টিন কোম্পানির ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখিন পোশাক-পরা তরুণ-তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক গে, আমার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়াসাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাঢ় দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশি। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসিমা কিছু টাকার দরকার বলে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছে। ধনেপ্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে!

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বলল—চাঁপাডাঙা ইস্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন স্যার?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ায়?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকাও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোনো কথা না বলে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হল, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি না ওরা কোথায় যাবে? কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্তার ভরসা না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা স্যার, ওপারে গাড়ি পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ির কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ি—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাড়ি।

—লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত করে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদুর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা, রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবারও ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন স্যার?

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়।

যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে একটু এগিয়ে বসেবললে—যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

তবে ইলোপমেন্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে।

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন।

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কালঅমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশি দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

—অনেক দূর থেকে স্যার, ধানবাদের কাছে সয়লাডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন? ওই মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে!

চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপরদিকে কেমন একটু বাঁকানো, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়িভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের, বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙাতে কোনো লোকের বাড়ি আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব?

—না স্যার, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তা হলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও খাবে না পর্যন্ত।
যে-কোনো তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে—সে-ভরসা করি নে স্যার—ওর সে মূর্তি দেখলে, আমি ওর দাদা, আমি পর্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙা স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরনের হবে আর একটু পরে।

চাঁপাডাঙা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়িঘর বেশি নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশ পান-বিড়ি, মুড়ি-মুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ওপারে দু-একখানা চাষাভুষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দু-তিনখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্যন্তই তারা যায়, নদী পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ির—তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়ত ইস্টিশানেই থাকবেন রাতে?

—না স্যার, কাল অমাবস্যা, আমায় তিরোল পৌঁছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগগির হয় পৌঁছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি করে এই অন্ধকার রাত্রে?তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটুক!

গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। তিরোলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ি পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, ভয়ভীত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে আমরা তিনজন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্তত আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে!

বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বললে—না। গায়ে দেবার কিছু ধরুন, এ-বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়িতে বসে ছিলাম—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে দামোদর? আমিজানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ি কিনা? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ায় নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাবে না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবে কেন?চুপ করে বসে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়িঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবুমশাইরা, শামকুড়ের গোয়ালাপাড়ায় গরুর গাড়ি পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন।

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁহ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিলে।

বললে—দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা?

পূর্ণিমা বললে—বর্ধমান থেকে কেনা আসবার সময়। খারাপ হয় নি? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা, ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকোতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে খাবার খাব এভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন। বাড়িতে মা-বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল এদের।

কিন্তু পরবর্তী মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয়, সেদিন তাদের সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তাহলে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর গাড়ি নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য করে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তার পরিশ্রমের জন্যে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ি থেকে তামাকের টিনটা নেওয়াহয় নি—গাড়ি গাঁয়ের মধ্য দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশি দেরি হবে না বাবু—

শামকুড় গ্রামের মধ্যে গাড়ি ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন,লোকের বাড়িঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখান-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসিমার বাড়ি এখান থেকে কত দূর হবে?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পুবদিকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো!

—কি আর কষ্ট?...আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে মাসিমার বাড়ি গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে—কি আর কষ্ট, না? আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরনের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোনো দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হলে এ ধরনের হাসত না, অন্তত এ-জায়গায় ও এ-অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি? আমার ভয় হল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো? আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয়!

গাড়িতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ি আপন মনে চলছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ির ছইয়ের মধ্যে অন্ধকার, আমার মনে হল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কষ্টকর 'আঃ' শব্দটা আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে আর ওরা বসেছে গাড়ির পেছন দিকটায়, সেদিকে বেশি অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা।

আমি কোনো কথা বলবার পূর্বেই যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ি থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ির গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত কণ্ঠে'উহু-হু হু' বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণ গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু? কি হয়েছে?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোনো কিছু বাধা দেবার পূর্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ির সামনের দিকে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নাবাবার পূর্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দুজনেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোনো পাত্তা কোনো দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোলে যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিনজনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণে ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু শিগগির চলুন, কাছেই পাঁতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপকলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা যে, যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে, সে-কথা দুজনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারেপৌঁছলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় কষার ঝাড়। তন্ন তন্ন করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে।

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে—আর কোনো দিকে কোনো জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না বাবু, কাছেপিঠে আর জলা নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দু-জন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যতদূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশিও হয়ত। তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে লোকটা বলে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়িতে বসে। আমি বাবু গোয়ালঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্ধ্যের একটু পরেই—দেখি গোয়ালঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রিলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু। ইকি! তারপর বাড়ির লোক এসে পড়ল। তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়িতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের একি কষ্ট! চলুন গরিবের বাড়ি। দুটো ডাল-ভাত রান্না করে খান। দিদিঠাকরুণের মাথাটা ভাল যদি হত একটু তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষ্মীর পিরতিমে। আমাদের বাড়িতে তাঁর পায়ের ধুলা পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা করে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়িতে তিরোল পৌঁছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

বাড়িটার কথা এখানে একটু ভাল করে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি, সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল চলে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে। তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়িটা ও-দেশের চলন-মত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় একখানা বৈঠকখানা, তার দুই কামরা মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠান—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরেরউঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধাড়া। জাতিতে কৈবর্ত। সুতরাং তাঁদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না। রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসবজি ছ'জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রান্নাকরলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্তি ধরেছে। তার কথাবার্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানারকম কথাবার্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লাম—সকলের সঙ্গে আলাপ হল পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, নাকি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ি কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল।

তারপর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি? আমি বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা।

বলেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়?বড় কষ্ট হল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ-জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরনের দু'একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম। আমাদের সয়লাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা—

—বেশ, যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

—এই পূজার সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পুজো হয়, একখানা কলিয়ারির বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়, —

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন—সাঁওতালের নাচ, সে একটা দেখবার জিনিস, আসুন পূজার সময়—ভারি খুশি হব আমরা আপনি এলে।

পূর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তা হলে কথা রইল কিন্তু দাদা। রোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বললে আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পূর্ণিমা বললে—তাহলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকি—ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না।

পূর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারী বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কেমন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি এমন সময় আমার মনে হল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পূর্ণিমার দাদারনাক-ডাকার শব্দ। অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে—যেন গোঙানি বা কাতরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ শুনতে পেলুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরার দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ির লোকও না। আরও আধ ঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এঁরা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তারপরে সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিগ্যেস করলে, এঁরা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো। গরমে সারারাত ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন-টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দশোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হল না।তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানলাটা দিয়ে উকি মেরে দেখতে পেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলাম, কিন্তু একবার দেখাটা দরকার, ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

জানালা দিয়ে যা দেখলুম তা এই—

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল—ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে একখানা চৌকি পাতা, পূর্ণিমার দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেজেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেজে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেজের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চিৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারিধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না, মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে তুললে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ি ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশি রক্ত নেই, কেবল শাড়ির সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে-লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো—পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিশ এল। আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন করে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছানা। উন্মত্ততার ঘুম সহজে ভাঙে নিতাই রক্ষে—দুপুর পর্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমোল। পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হল।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্যন্ত।...

সয়লাডি কলিয়ারিতে টেলিগ্রাম করা হল। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথম শুনলুম, পূর্ণিমা বিবাহিতা। পাগল বলে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই, তাও এই প্রথম শুনলুম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হল। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্যভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুন ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ-আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ি নিয়ে যেতে রাজি নয়। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হল হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাডিতে আসবেন কিন্তু একদিন! মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা?দাদাকে দেখছি নে! দাদার কাছে কানের দুল দুটো খোলা রয়েছে, কান বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগেকার কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ানো, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্তনশালী ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এতদিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ-আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম-ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।